Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম প্যারেন্টিং

(সন্তান প্রতিপালনের গাইডলাইন)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মার্জিয়া মুস্তারিন
রোলঃ ২২৮০২১৭২৯

২৫ মে,২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম প্যারেন্টিং

(সন্তান প্রতিপালনের গাইডলাইন)

এই রিপোর্টটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মার্জিয়া মুস্তারিন
রোলঃ ২২৮০২১৭২৯

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "***মুসলিম প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালনের গাইডলাইন)***" বিষয়ক গবেষণাপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ***মার্জিয়া মুস্তারিন***, আইডিঃ ২২৮০২১৭২৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটার্নালঃ

মাওলানা আরমান হোসাইন

কুরআন ট্রান্সলেসন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "***মুসলিম প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালনের গাইডলাইন)***" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ***মুফতী মুজিবুর রহমান*** উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

মার্জিয়া মুস্তারিন

আইডিঃ **২২৮০২১৭২৯**

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৫ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

তারবিয়াতুল আওলাদ

তারবিয়াহ শব্দের অর্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া, প্রতিপালন করা, গড়ে তোলা। *তারবিয়াহ* শব্দটি এসেছে *রব* অর্থাৎ প্রতিপালক থেকে। বাচ্চাদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে গড়ে তোলাকে *তারবিয়াহ* বা *প্যারেন্টিং* বলে।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যারা বাবা-মা আছি, তাদের দায়িত্ব হলো সন্তানকে সঠিক তারবিয়াহ দিয়ে গড়ে তোলা। বড় করবো এটাই হচ্ছে ***তারবিয়াতুল আওলাদ***।

আর আমানাহ হলো—আমাদের সন্তান-সন্ততি আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানাহ। যখন মা-বাবার কোল জুড়ে একটি সন্তান আসে, তখন সবাই আনন্দিত হয়। তখন সন্তানকে নিয়ে কত প্ল্যানিং শুরু হয়—তাকে কী খাওয়াবো, কী পড়াবো ইত্যাদি। অনেক স্বপ্ন দেখি। যখন কথা বলা শুরু করে, তখন আরেকটি চক্রে আনন্দের মুহূর্ত পার করি। আমরা প্ল্যানিং করি—বাচ্চা কোন স্কুলে পড়বে, বড় হয়ে উচ্চ শিক্ষিত হবে, ভাল বেতনের জব করবে। তারপর ভাবি, আমার সন্তান সম্মানের সাথে বাস করবে। বিয়ের বয়স হলে ছেলের জন্য সুন্দর বউমা এবং মেয়ের জন্য ভাল ছেলে, ভাল পরিবারের স্বপ্ন দেখি।

প্রত্যেকটা বাবা-মা-ই এসব স্বপ্ন দেখে। কথাটা হলো—আমরা মুসলিম বাবা-মা ও কি এমন আর দশটা মা-বাবার মতো হবো? এসব স্বপ্ন দেখা এবং এমনভাবে সন্তানদের গড়ে তুলবো?

মুসলিম মা-বাবার দায়িত্ব হলো সন্তানকে সঠিক তারবিয়াহ দেওয়া। আমাদের সমাজ এখন ফিৎনাময়। আগে মানুষ গোপনে পাপ করতো, এখন সকলে পাপ

প্রকাশ্যে করে বেড়াচ্ছে। আজ থেকে দশ বছর আগের দিনগুলো ও এখনকার সময়ে ব্যাপক পার্থক্য আছে। এখন পুরোটা সমাজ ফিৎনাময়—সুদ, ঘুষ, যেনা, মাদকাসক্তি অহরহ হচ্ছে। এখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে—আমরা মুসলিম এবং মুসলিম শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব রয়েছে আমাদের।

আমাদের সন্তানদের প্রতিপালন করতে হবে চোখ-কান খোলা রেখে। অন্য মায়েরা যেভাবে *প্যারেন্টিং* করবে, আমাদের *প্যারেন্টিং* তেমন হবে না। আমরা আমাদের বাচ্চাদের সেক্যুলার *ওয়ে*তে *প্যারেন্টিং* করব না।

আমরা ভালো মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে সন্তানদের ইসলামিক *ওয়ে*তে বড় করব।

ভাল মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের করণীয়ঃ

১. ভাল মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
২. ভাল আদব-কায়দা শেখাতে হবে।
৩. ইসলামিক স্কুল—যেখানে *ফ্রি মিক্সিং* না থাকে, এমন প্রতিষ্ঠানে দিতে হবে।
৪. ভাল ইসলামিক *শিক্ষা* দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
৫. পোশাক-আশাকের বিষয়ে ইসলামের বিধান মেনে চলাতে হবে।
৬. খাওয়া, ঘুম, গোসল, বাথরুমে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলোতে সুন্নাত মোতাবেক করাতে হবে।

সন্তানের জন্য আমাদের অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা। আল্লাহ কুরআনে সম্পদ ও সন্তানের কথা একসাথে উল্লেখ করেছেন। সন্তানকে আল্লাহ আমাদের আমানত হিসেবে দিয়েছেন।

সূরা কাহাফের ৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন—

اَلۡمَالُ وَالۡبَنُوۡنَ زِیۡنَۃُ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ وَالۡبٰقِیٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَیۡرٌ عِنۡدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَّخَیۡرٌ اَمَلًا

অর্থঃ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা; আর স্থায়ী সৎকাজ আপনার রব-এর কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।

সম্পদ ও সন্তান, আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা হিসেবে দিয়েছেন। আল্লাহ কাউকে দিয়ে পরীক্ষা নেন, আবার কাউকে না দিয়ে পরীক্ষা নেন। আমাদের উচিত, নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করা— আমি কি সন্তানকে ভালভাবে *প্যারেন্টিং* করতে পারছি? নাকি পরীক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছি?

সূরা আত-তাহরিমের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন—

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ وَاَهۡلِیۡکُمۡ نَارًا وَّقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَۃُ عَلَیۡهَا مَلٰٓئِکَۃٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَیَفۡعَلُوۡنَ مَا یُؤۡمَرُوۡنَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যেখানে নিয়োজিত রয়েছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তাঁরা তা অমান্য করে না যা তাঁদের আদেশ করা হয়েছে এবং যা আদেশ করা হয়েছে তাঁরা তাই করে।”

এই আয়াতে আল্লাহ আমাদের বড় একটা দায়িত্ব দিয়েছেন। মা-বাবা হিসেবে আমাদের সেই কাজগুলো করতে হবে, যা করণীয়—যার ফলে তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো যায়। আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আমরা তাদের জন্য কী করেছি? আমাদের যা যা করণীয় ছিল, তা ঠিক মতো পালন করেছি কি না।

আমরা *প্যারেন্টিং* করবো কখন থেকে?

→ বাচ্চা জন্মের পূর্ব থেকেই। সন্তানের বাবা-মা নির্বাচন করতে হবে সঠিকভাবে। *ইন্টারকোর্স* এর সময় এই দোআ পড়তে হবে।

بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "যদি কেউ স্ত্রী সহবাসের সময় এই দুআ পড়ে, আর তাদের মাধ্যমে কোন সন্তান নির্ধারিত হয়, তবে সেই সন্তানের কোন ক্ষতি শয়তান করতে পারবে না।" -
সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৪১ এবং সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৪৩৪

সন্তানকে বড় করব—দ্বীনটাকে প্রাধান্য দিয়ে। সব সময় মনে রাখব—আমরা শুধু খাব, ঘুমাব, হিফজ করবো—এমন মুসলিম না, একদম জান্নাতি মানুষ হিসেবে বড় করবো। হিফজ করালাম আর হয়ে গেল এমন না। যেন তারা আমল করে সেইভাবে তাদের গড়ে তুলবো।

বিভিন্ন প্রজন্মের সন্তান

প্রজন্মঃ

i) ১৯৬৫ - ১৯৭৯ (প্রজন্ম x)

ii) ১৯৮০ - ১৯৯৪ (প্রজনন - y)

iii) ১৯৯৫ - ২০০ (জেনজি প্রজন্ম)

iv) ২০১০ - ২০২৫ (জেনারেশন আলফা বা গ্লাস জেনারেশন)

রেফারেন্স লিংকসমূহ:

Where Millennials end and Gen Z begins

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/

Generation Alpha – Defining

https://mccrindle.com.au/insights/blogarchive/generation-alpha-the-defining-traits/

আমাদের সন্তানেরা জেনারেশন আলফা সময়ের।

জেনারেশন আলফার বৈশিষ্ট্যঃ

১. সবচেয়ে শিক্ষিত প্রজন্ম,

২. প্রযুক্তিগত দক্ষতা,

৩. তথ্য প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাদের জীবনের অংশ

৪. তাদের শিখণ পদ্ধতি একদম ভিন্ন। যেমনঃ
মুখস্থের পরিবর্তে ফোনে বিভিন্ন থিওরি শেখা।
৫. সোশ্যাল মিডিয়া অনেক উন্নত হবে।
এগুলো তাদের জীবনের অংশ হবে।
৬. তারা নিয়মতান্ত্রিক জীবন পছন্দ করে না।
৭. তাদের অধিকাংশই হবে ধর্মহীন।
এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাদের ছোটবেলা থেকেই।
৮. তারা আত্মকেন্দ্রিক হবে ও স্বাধীনচেতা হবে,
৯. তারা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।
১০. ভিন্ন রকম শৈশব।
১১. সহজেই ফেতনায় প্রতিত হয়। যেমন: পর্ন আসক্তি, স্ক্রিন আসক্তি, মাদকাসক্তি, যেনা, পরকিয়া ইত্যাদি।
১২. তারা অনেক বেশি আনন্দ ফুর্তিতে থাকতে চায়।
যেমন: থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন, 14 ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি।

প্রতিপালনে করণীয়

১. মা-বাবাকে প্রথমত পারিবারিক নীতিমালা তৈরি করতে হবে (নিষেধ, আদেশ থাকবে, হোমওয়ার্ক টাইম, সবকিছুর সীমা নির্ধারণ করতে হবে)। ছোট বাচ্চাদের সালাম শেখানো। বাচ্চাদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

রোল মডেলঃ কে সেটা নির্ণয় করতে হবে। মা-বাবাকে সর্বপ্রথম সচেতন হতে হবে। নিজেকে রোল মডেল হিসেবে, অর্থাৎ আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মা নামাজ পড়লে, পর্দা করলে, ছেলে-মেয়েরাও নামাজি হবে। আর রোল

মডেল হবেন নবীজী (সঃ) ও সাহাবীরা। আমাদের মুসলিম পরিবারের ছেলে-মেয়েরা যেন পশ্চিমাদের অনুকরণ না করে, এটা মাথায় রাখতে হবে।

২. শিশুকাল থেকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া। সবার আগে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালিমা শিখানো। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে তখন।

৩. বর্তমান ও আগামীর ফিৎনা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা এবং এসব নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করা। ফিৎনার প্রতি ঘৃণা জন্মানো। যত ফিৎনা আছে জগতে।

৪. সত্যবাদীতা, ন্যায়নীতি ও সততা শেখানো।

৫. সন্তানেরা অনেক কিছু শেয়ার করতে চায়। সন্তান যেন তার মা-বাবার সাথেই শেয়ার করে। যা কিছু জানতে চায়, তা যেন জানতে পারে। তারা যেন আমাদের কাছেই বলতে পারে। মা-বাবাকে সেইভাবেই সন্তানকে গড়ে তোলা। মা-বাবাকেই যেন শেয়ার করার ভরসা পায়। বোন, বন্ধু বা ফেসবুকে নয়। সন্তানের সাথে ফ্রি হতে হবে।

৬. বন্ধু নির্বাচনে সন্তানকে সাহায্য করা। যার সাথে সন্তান মিশছে, তার বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে, যেন সেই বাবা-মাকে নাসিহা করা যায়। আর মুসলিম পরিবার হলেই হবে না। যারা দ্বীনদার তাদের সাথে সন্তানকে বন্ধুত্ব তৈরি করে দেওয়া। সন্তানকে শিখাতে হবে বন্ধু ভুল করলে তুমি ওকে নাসিহা দিবে।

৭. স্ক্রিন টাইম নির্ধারণ করে দিতে হবে। ছোট বাচ্চাদের ২ ঘন্টা সময়। আর ফোন বা ডিভাইস না দেওয়াই সবচেয়ে ভালো।

৮. তাদের মস্তিষ্কের চেয়ে কলবের যত্ন নিতে হবে। এটিতেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। মিউজিক শোনা থেকে দূরে থাকা। মিউজিকযুক্ত খেলনা দেওয়া যাবে না। কার্টুন মিউজিক ছাড়া হলে দেখতে দেওয়া যেতে পারে। না দেওয়াই ভাল। কারণ এগুলো বাচ্চার হৃদয়ে একটা ইফেক্ট পড়ে।

৯. সহনশীলতা ও সহানুভূতি শেখাতে হবে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এগুলোর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যেমনঃ খেলনা নিয়ে ছোট বাচ্চার মধ্যে ঝগড়া বাধলে সেখানেও সহনশীল ও ধৈর্য ধরতে শেখানো।

১০. বাচ্চার বয়স ১০ বছর হলে বিছানা আলাদা করতে হবে। ৭ বছর থেকে নামাজ শেখানো। আর বাচ্চাদের শেখাতে হবে, একটু বড় হলে মায়ের অনুমতি নিয়ে রুমে ঢুকতে হবে।

১১. ইসলামিক নিয়মনীতি মেনে চলে, এমন প্রতিষ্ঠানে পড়ানো। এবং আবাসিক স্কুলে বাচ্চাকে রাতে না রাখা উত্তম।

বিভিন্ন ধরনের প্যারেন্টিং স্টাইল

সাধারনভাবে ৪ ধরনের প্যারেন্টিং স্টাইল মা-বাবারা ফলো করে থাকেন।

১. **Authoritarian Parenting:** → কঠোর হন মা-বাবারা এই প্যারেন্টিং -এ।

২. **Uninvolved Parenting:** → অবহেলা করেন এই স্টাইল -এর পিতা-মাতা। সন্তানকে গুরুত্ব দেন না।
Still Face Experiment-এ প্রথমে ভালো অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন সন্তানকে মনোযোগ দেওয়া হয়।

৩. **Permissive Parenting:** → এখানে সন্তানদের প্রতি কোনো প্রত্যাশা থাকে না। মা-বাবারাও নিজেরা বোঝেন না, কীভাবে সন্তান পালন করতে হয়। তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করে না। কোনো রুলস তারাই মেনে চলে না। অনেক মা-ই নিজের প্রতি যত্নশীল নন। তারা সময় অনুযায়ী খায় না, গোসল করে না ঠিকভাবে। এতে সন্তানরাও নিয়ম মেনে চলে না।

যেমন: মা সন্তানকে কোনো বিষয়ে নিষেধও করে না, আবার আদেশও করে না।কোনো রুলস থাকে না। এ পরিবারে কোনো নিয়ম থাকে না।সন্তানদের কোনো শাসন পদ্ধতি থাকে না।
Permissive Parenting-এর বৈশিষ্ট্য হলো—কোনো নিয়ম থাকে না, কোনো স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম দাঁড় করানো হয় না।এই প্যারেন্টিং -এ সন্তানরাও বুঝে যায়, তারা ভুল করলেও মা-বাবা কিছু বলবে না।

যেমন: এখনকার সন্তানরা মাকে মেনে চলে না। কথা তো শুনেই না, উল্টো রাগ দেখায়। মায়ের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কোনো সম্মান দেখায় না।

ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে শেখাতে হবে—মা-বাবার কথা শুনতে হবে। কিন্তু এই প্যারেন্টিং এ কোনো সীমা নির্ধারণ করা থাকে না। আদেশ-নিষেধ, কোনো বিষয়েই নিয়ম মেনে চলে না।
সন্তানেরা ফোনে গেম খেললেও মা-বাবারা কিছু বলেন না। বাবা-মা নিজেরাও *ফেসবুক* ও *টিকটক*-এর প্রতি আসক্ত হন।
মায়েরাও নিয়মমতো গোসল, ঘুম, নামায, খাওয়া—এগুলো করেন না।

সন্তানের সাথে *বন্ধু* হয়ে যাওয়া যাবে না। তাকে আদেশের মধ্যে রাখতে হবে। সন্তানের সাথে বেশি *ফ্রি* হয়ে যাওয়ার ফলে মা-বাবার সাথে মারামারি করতে গিয়ে অনেক সন্তানকে দেখা যায়, বাবা মাকেই লাথি দিয়ে দেয়।

সন্তানকে ঘুষ দেয়, অর্থাৎ কোনো কথা মানানোর জন্য বলে— "তুমি এটা করলেই তোমাকে গিফট দিব।" কিন্তু এরূপ করা যাবে না। এর ফলে সন্তানেরা কাজটা আল্লাহকে খুশি করার জন্য করে না।

Yellow Light Method–ও বলা হয় একে। মানে, এখানে কোনো *লিমিট* নাই। সন্তানরা চাইলে করতেও পারে, নাও পারে। তারা থামতেও পারে, নাও পারে।

প্রভাবঃ

১. আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকে না।

২. ডিসিপ্লিন থাকে না।

৩. *Rules*, *Regulations* মেইনটেইন করতে পারে না।

৪. তারা *demanding type*-এর হয়।

৫. বড় হওয়ার পর সন্তানেরা নিজেদের নিরাপদ মনে করে না।

৬. ইসলামিক রুলস গুলো অন্যদের জন্য—এটাই তারা মনে করে।

৭. বাবা-মার প্রতি বেশি প্রত্যাশা করে।

৮. নিজের কাজ নিজে করতে পারে না—ভাত বেড়ে খাওয়া, গোসল, কাপড় গোছানো।

৯. পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

১০. অন্যকে সম্মান করতে শিখে না।

১১. সঠিক তারবিয়াহটা পায় না।

১২. খেলার জিনিস থেকেও শিক্ষা নেয় শিশুরা। সেসব শিশুরা *বাম* খেলনা পায়, তারা নিজেরা নিজেদের গেম তৈরি করে নেয় বা খেলনা বানায়। এটি একটি অমূল্যবান বিষয়। *Permissive parenting*-এর শিশুরা এমন সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী হয় না।

১৩. চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটে যেমন: সিগারেট খায়, পর্নো দেখে। মা-বাবা জেনেও তা সংশোধন করে না। যার ফলে নাস্তিক প্রজন্ম গড়ে ওঠে।

১৪. ভাল রেজাল্ট করতে পারে না।

১৫. সন্তানেরা বাবা-মার আর্থিক বিষয় বিবেচনা করে না।

১৬. সন্তানেরা কখনই বড় হয় না মা-বাবার কাছে। বড় হয়েও ছোট থাকে।

১৭. সামাজিক দক্ষতাও থাকে না।

৪. অথরেটেটিভ প্যারেন্টিংঃ আল্লাহ তোমার মা হিসেবে আমাকে বেছে নিয়েছেন। আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম-আহকামগুলো তুলে ধরেন সন্তানের সামনে। এখানে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন মা-বাবারা। মা-বাবা ও সন্তানকে

সম্মান দেখান। কারণ, তার আবদারগুলো মা-বাবারা শুনেন, ঠিক কিন্তু সব আবদার পূরণ করেন না। যেমন: নেট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করে দেন। সন্তানরাও বুঝে ফেলে ভাল-মন্দ। সন্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় কিন্তু শর্ত প্রদান করা হয়। তার তারবিয়াহের সকল বিষয়গুলো...

তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। মা-বাবাকে সাপোর্ট করে তারা। সন্তানকে বলতে হবে—"এখন কী করা যায়?"—যখন সে সমস্যায় পড়ে। তখন সন্তানরাও চিন্তা করতে শেখে, যার ফলে ভুল থেকে শিখে। সন্তানকে এটাও বোঝাতে হবে—"তুমি ভুল থেকে কী শিখলে?" বাচ্চাকে রোখাতে হবে যেন বারবার ভুল না হয়। সন্তানকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। প্রশংসা করা আর উৎসাহ দেওয়া আলাদা বিষয়। প্রশংসা করলে বাচ্চা অহংকারী হয়ে পড়ে। এটাই সঠিক পদ্ধতি সন্তান পালনের ক্ষেত্রে।

এর প্রভাবঃ

১. বড় হলে দায়িত্বশীল হবে।

২. পারস্পরিক সম্পর্কে তারা সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী হয়।

৩. স্বাধীনভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত বেছে নিতে পারে।

৪. নিয়ম-কানুন ও অথরিটির প্রতি সম্মান দেখায়।

৫. সন্তানদের সঙ্গে নিয়েই নিয়ম তৈরি করা হয়—ফলে তারা সেই নিয়মকে সম্মান করে।

৬. মা-বাবাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেও প্রচুর ভালোবাসে।

৭. আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৮. আত্মসম্মানবোধ থাকে। নিজেকে ছোট মনে করে না। নিজেকে ছোট মনে করা বা তা প্রকাশ করা—এটা বোকামি এবং এতে আল্লাহর শোকর আদায় হয় না।

৯. নিজেরাই সমস্যা সমাধান করতে পারে।

১০. শুরুতেই আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়।

১১. অভিভাবকের কথাগুলো গুরুত্ব সহকারে মেনে চলে।

১২. শিক্ষাক্ষেত্রে সফল হয়।

১৩. হতাশাগ্রস্ত হয় না।

১৪. অসামাজিক কোনো কার্যকলাপে জড়ায় না।

১৫. নিজের ইচ্ছা জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় না।

১৬. নেতৃত্বের গুণ অর্জন করে; নেতৃত্বে সফল হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, বাবা পারমেসিভ প্যারেন্টিং করেন আর মা হয়ে ওঠেন অথোরিটেটিভ। এমন ক্ষেত্রে বাবা-মাকে আলোচনা করে একমত হতে হবে। দিনশেষে সন্তানের মঙ্গল এবং পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য **অথোরিটেটিভ প্যারেন্টিং স্টাইল**-ই সফলভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।

মা-বাবার উপর সন্তানের অধিকার বা হক

সূরা আত-তাহরিম, আয়াত ৬: *“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর...”* এ আয়াত আমাদের উপর সন্তানের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: *“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”* (সহীহ বুখারী - ৮৯৩ ও মুসলিম - ১৮২৯)

সন্তানের হক (অধিকার) সমূহ:

১ম হক: ভালো বাবা নির্বাচন করা।
রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “যখন কোনো ছেলে নৈতিক চরিত্র ও দ্বীনের দিক থেকে উত্তম হয়, তখন তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দাও।” (তিরমিযি, হাদীস নং ১০৮৪)

২য় হক: সন্তান জন্মের পর ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী পালন করা।
তাহনিক করা অর্থাৎ শিশু জন্মের পরেই খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দেওয়া।
সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা।
সপ্তম দিনে আকিকা করা।
মাথা মুন্ডন করা (ছেলের ক্ষেত্রে সুন্নাত, মেয়েদের ক্ষেত্রে না করাই উত্তম)।

৩য় হক: তারবিয়াহ ও তালিম (শিক্ষা ও চরিত্র গঠন):

সন্তানকে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া।

নামাজ, কুরআন, পর্দা, হালাল-হারাম, হুকুম-আহকাম শেখানো।

বিশেষ করে মা-ই সন্তানের প্রথম শিক্ষিকা হওয়ায় তার দ্বীনী জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, “প্রথমে সন্তানকে আদব শেখাও, এরপর জ্ঞান শেখাও।” (ইহইয়াউল উলুম, ইমাম গাজ্জালী)

৪র্থ হক: প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া

হাদিস ও সাহাবীদের বর্ণনা অনুযায়ী সন্তানদের উপর ইসলামী শিক্ষার হক:

আবু রাফি (রাঃ) বলেন: *“আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ (সঃ), আমাদের সন্তানদের কি আমাদের উপর কোনো হক আছে?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ—তাদের লেখাপড়া শেখানো, সাঁতার শেখানো, তীর-নিক্ষেপ শেখানো এবং তাদের হালাল সম্পদের উত্তরাধিকারী করা।”* (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

সুফিয়ান (রাহঃ) বলেন: *“তোমাদের সন্তানদের হাদিস শিখতে বাধ্য করো।”*

এই হকের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ করণীয়:

১. **সপ্তাহে অন্তত একটি হাদিস শেখানো:** প্রতিদিন না পারলেও সপ্তাহে অন্তত একটি হাদিস যেন সন্তান শেখে, সেটা অভ্যাস করানো জরুরি।

২. **শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব গঠনের উপর জোর: ডঃ আব্দুল হাকিম আনিস** সাহেবের বই অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

১. সন্তানের নাম অর্থবোধক ও পরিচ্ছন্ন রাখা।

২. ছোটবেলা থেকেই দায়িত্ববোধ শেখানো।

৩. তাদের জন্য নিয়মিত দোআ করা।

৪. তাদের ভালো, দ্বীনদার মানুষের সংস্পর্শে রাখা।

দ্বীনদারদের বাসায় বেড়াতে নেওয়া।

ভালো ইসলামিক স্কুলে ভর্তি করানো।

মসজিদে নিয়ে যাওয়া।

৫. ইলমের মাহফিল ও ইসলামী শিক্ষামূলক সভায় সন্তানদের নিয়ে যাওয়া।

এতে তাদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়।

৬. ভালো কাজে সহযোগিতা করা: যেমন: বাইসাইকেল কিনে দেওয়া, ভালো অভ্যাসে উৎসাহ দেওয়া।

৭. সব কাজ মনিটরিং করা ও আদব শেখানো:

বড়দের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়, শেখানো

বারবার ডাকলে "জি" বলে উত্তর দেওয়া শেখানো

দাদা-দাদি, নানা-নানীর সাথে ভদ্র আচরণ শেখানো

৮. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে দেওয়া: যেন সন্তান আত্মিকভাবে পরিপূর্ণ হয়—তাহলে আলাদা করে দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

৯. কল্যাণের পথে চালিত করা: ভালো কাজে আগ্রহ তৈরি করা ও সহায়তা করা।

১০. ফিতরাতগত চাহিদা পূরণ করা: যেমন: উপযুক্ত বয়সে সন্তানকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া।

১১. অনুভূতি ও চিন্তায় শালীনতা আনা:

খারাপ ছবি দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া শেখানো

মেয়েদের দিকে নজর না দেওয়া

গান না শোনা ইত্যাদি।

১২. ভালো বন্ধু নির্বাচন শেখানো:

ভালো বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

খারাপ সঙ্গ ত্যাগের টেকনিক শেখানো

১৩. দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা:

নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া

তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস তৈরি করা

৫ম হকঃ ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া সন্তানকে এমন কাজে আগ্রহী করে তোলা যা সমাজ ও ইসলামের দৃষ্টিতে কল্যাণকর:

সদাকা দেওয়া

গাছ লাগানো

শীতবস্ত্র বিতরণ

বন্যার্তদের সাহায্য করা

অসহায়দের সহায়তা করতে শেখানো

৬ষ্ঠ হকঃ ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা

সন্তানদের মধ্যে তুলনা না করা

কারো প্রতি পক্ষপাত না করা

সবাইকে সমান ভালোবাসা দেওয়া

হাদিস:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ:

"تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَرْجِعْهُ."

নু'মান ইবন বাশীর (রাঃ) বলেন:

আমার পিতা আমাকে কিছু সম্পদ দান করেছিলেন। আমার মা (আমরাহ বিনতে রাওয়াহা) বললেন, "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ না তুমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাক্ষী করো।" তখন আমার পিতা নবী (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, “আমি আমার এ ছেলেকে একটি দান দিয়েছি।”

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই এমন দান দিয়েছ?” তিনি বললেন, “না।” তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন,

“তাহলে আমাকে এর সাক্ষী করো না, কারণ আমি অন্যায়ের সাক্ষী হই না।”

সহীহ বুখারী - ২৫৮৬ ও সহীহ মুসলিম - ১৬২৩

৭ম হকঃ উত্তম জীবনসঙ্গী বেছে নিতে সাহায্য করা

সন্তান বড় হলে তাদের জন্য দ্বীনদার ও নৈতিক জীবনসঙ্গী খোঁজা

বিয়ের আগে সঠিক পছন্দে সহায়তা করা

পরামর্শ দিয়ে পথ দেখানো।

৮ম হকঃ বিবাহ প্রদান ও শিক্ষা

সন্তানের উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দেওয়া

বিয়ের বিধান ও দায়িত্ব শেখানো

সংসার জীবন সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া

৯ম হকঃ সন্তানের জন্য খরচ করা

ছেলের জন্য: সাবালক হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় খরচ চালানো। যেমন খাবার, কাপড়, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি।

মেয়ের জন্য: বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত খরচ চালানো এবং বিয়ের সময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

১০ম হকঃ সন্তানের জন্য দোআ করা

হিদায়াতের জন্য: যেন সন্তান সঠিক পথ ধরে চলে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা পায় এগুলো কামনা করে

নিরব ও প্রকাশ্যভাবে দোআ করা—ঘুমানোর সময়, নামাজের পর, তাহাজ্জুদের সময়, ইত্যাদি।

মায়েদের স্ক্রিন-আসক্তি ও সন্তানের উপর প্রভাব

১. আপনি কি এমন জিনিসও অনলাইনে অর্ডার করে ফেলেন, যা না কিনলেও চলত? পরে কি আফসোস করেন?

২. আপনি কি আপনার ইন্টারনেট নির্ভরশীলতা পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের কাছে গোপন করেন অথবা অস্বীকার করেন?

৩. আপনি কি হালকা হওয়ার জন্য বা সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাওয়ার উপায় হিসেবে ইন্টারনেটকে বেছে নিয়েছেন?
আপনি যখন ইন্টারনেট চালু বা বন্ধ করার চেষ্টা করেন, তখন কি আপনি অস্থির, বিষণ্ণ বা উত্তেজিত হয়ে পড়েন?

৪. আপনি কি ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে নিয়মিত ঘুমাতে পারছেন না?

৫. আপনি কি ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে শারীরিক সমস্যা যেমন—ওজন বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া, মাথাব্যথা, কোমর বা পিঠে ব্যথা, হাতে ব্যথা ইত্যাদি অনুভব করেন?

৬. আপনি কি অতীতে ইন্টারনেটের প্রতি আপনার অদম্য আকর্ষণ কমানোর বা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কোনো চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন?

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি আপনার হ্যাঁ হয় তাহলে আপনি একজন স্ক্রিন আসক্ত ব্যাক্তি।

স্ক্রিন আসক্তির প্রধান কারণসমূহঃ

১. তথ্য সংগ্রহের উৎসাহ ও কৌতূহল
২. ভার্চুয়াল সঙ্গি-সাথী
৩. বিকল্প বিনোদনের উৎস
৪. সোশ্যাল মিডিয়াতে স্ট্যাটাস আপডেট
৫. সমস্যা ও দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা
৬. অনলাইনে অহেতুক কেনাকাটা

স্ক্রিন আসক্তির প্রভাবঃ

১. মাথা ব্যথা, কোমর ও পিঠে ব্যথা
২. ইনসমনিয়া বা ঘুমের অভাব
৩. কার্পাল টানেল সিনড্রোম (হাতের ব্যথা) ৪. খাদ্যাভাসে পরিবর্তন
৫. চোখের সমস্যা
৬. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভাব (যেমন: গোসল না করা, দাঁত না মাজা—ফোন দেখতেই ব্যস্ত)
৭. এংজাইটি (উদ্বেগ)—যা গুজব থেকে হতে পারে, যেমন: “মাথা কাটা” বা “আবরার হত্যা”র মতো ভয়ের ঘটনা
৮. বিষণ্ণতা।

স্ক্রিন আসক্তির আরও কিছু ক্ষতিকর প্রভাবঃ

১. অসত্যতার প্রতি ঝোঁক
২. অপরাধবোধ

৩. প্রতিরক্ষামূলক আচরণ (নিজেকে সঠিক প্রমাণে অতিরিক্ত সচেষ্ট হওয়া)
৪. উচ্ছৃলতা বা অস্থির আচরণ
৫. পরিকল্পনামাফিক চলার অক্ষমতা
৬. একাকিত্ব বোধ
৭. সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলা
৮. কাজ এড়িয়ে চলা
৯. মানসিক অস্থিরতা
১০. মুড সুইং (হঠাৎ হঠাৎ মনের অবস্থা বদলে যাওয়া)
১১. অকারণে ভয় পাওয়া
১২. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা
১৩. ক্ষণেক্ষণে বিরক্ত হওয়া
১৪. গড়িমসি করা (কাজে বিলম্ব করা)

শিশুদের উপর স্ক্রিন আসক্তির প্রভাবঃ

শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকলেও মানসিকভাবে দূরে থাকি। কাছে থেকেও দূরে থাকা, ফোন দেখার কারণে এই অনুভূতি তৈরি হয়। এটি 'নেগলেক্টফুল প্যারেন্টিং' এর একটি ধরন।

শিশুরা নিজেদের প্রত্যাখ্যাত মনে করে। বাচ্চারা ভাবে, "মা আমাকে নয়, ফোনকেই বেশি ভালোবাসে।"

তাদের মধ্যে ভয়, উদ্বেগ ও অবসাদ তৈরি হয়। এটি 'Uninvolved Parenting'-এর একটি বৈশিষ্ট্য।

আত্মবিশ্বাস কমে যায়, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে।

শিশুদের মধ্যে জেদ ও একরোখা আচরণ বেড়ে যায়।

শিশুদের মধ্যে আদব-আখলাকের ঘাটতি দেখা দেয়। মা ফোনে ব্যস্ত থাকায় সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখতে পারে না, ফলে আদব-আখলাক শেখানো হয় না।

চীনের গবেষক Xiaochun Xie ও Julannie-এর Journal of Adolescence-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় বলেন
"যে সব মা-বাবা স্মার্টফোনে মগ্ন থেকে সন্তানকে উপেক্ষা করেন, তারা তাদের সন্তানকে বিষণ্নতার ঝুঁকিতে ফেলছেন।"

যখন সন্তানরা কিছু জানতে চায় বা কোনো সাহায্য চায়, আর তখন যদি মা-বাবা তাদের 'না' বলে বা উপেক্ষা করে, তখন শিশুর মনে তা 'উপেক্ষা' হিসেবেই প্রতিফলিত হয়। ফলে সন্তানের মধ্যে বিষণ্নতা তৈরি হয়। এমনকি নবজাতক শিশুর মাঝেও বিষণ্নতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে যদি মা তার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ফোনে আসক্ত থাকে।

প্রতিকারের করণীয়ঃ

১. **সময়সীমা নির্ধারণ করুন** – ফোন ব্যবহারের জন্য সময় বেঁধে দিন। যেমন: কিছু অ্যাপ আছে যেখানে "Focus Time" বা Timer সেট করা যায়। "Digital Wellbeing" নামে একটি অ্যাপ আপনি ব্যবহার করতে পারেন। এতে প্রতিদিন কতক্ষণ কোন অ্যাপ ব্যবহার করছেন তা দেখা যায় এবং কন্ট্রোল রাখা যায়।

২. **ব্রাউজার থেকে অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর কনটেন্ট রিমুভ করুন অথবা ব্লক করুন।**

৩. **ডিএক্টিভেট বা লগআউট করুন** – যে অ্যাপ বা সোশ্যাল মিডিয়া আপনার জন্য ক্ষতিকর মনে হয়, তা ডিএক্টিভেট করে দিন বা সাইন আউট করে রাখুন।

৪. **নোটিফিকেশন বন্ধ করুন**, অথবা **অ্যাপসে পাসওয়ার্ড লক করুন** যেন অহেতুক ঢুকে পড়া বা চেক করার প্রবণতা না থাকে।

৫. **ফোন দূরে চার্জ দিন** – বিছানায় ফোন চার্জ না দিয়ে দূরের টেবিল বা অন্য ঘরে রাখুন। (অনেকেই বিছানায় ফোন চার্জে দেন, এতে ঘুমের সময়েও ফোন ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে।)

৬. **পরিবারের সাহায্য নিন** – স্ক্রিন ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে পরিবারের সদস্যদের সাপোর্ট নিন। পরিবার একসাথে থাকলে এবং পরস্পরকে সাহায্য করলে আসক্তি কমানো সহজ হয়।

শিশুর আচরণ সংশোধন

যদি বাচ্চাকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে চাই, তাহলে: শুধু আদেশ-নিষেধ নয়, বরং তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সেই কাজের প্রশংসা করতে হবে। যে কাজগুলো বাচ্চা ইতোমধ্যে করে—সে সব কাজের প্রশংসা করুন। এতে বাচ্চা সহজেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত কাজটিও করে দেবে।

উদাহরণ: যদি বাচ্চা সালাত না পড়ে, হোমওয়ার্ক না করে—তখন জোর না করে বরং সে যে কাজগুলো করে, তার প্রশংসা করুন। **Praise** করা বাচ্চার আচরণ সংশোধনের জন্য খুব কার্যকর একটি কৌশল।

কীভাবে শুরু করবেন:

একটি একটি করে আচরণ সিলেক্ট করুন এবং লিখে রাখুন। এতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাড়ে।

যে খারাপ আচরণটি সংশোধন করতে চান, সেটিও লিখে রাখুন। যেমন: যদি বাচ্চা সালাত না পড়ে, তাহলে সেই বিষয়ে আলাদা ফোকাস করুন।

সঠিকভাবে প্রশংসা করার কৌশল:

প্রশংসা মানে অনুমোদন করা, অর্থাৎ পজিটিভ ফিডব্যাক দেওয়া। এর ফলে বাচ্চা খুশি হয়, আনন্দ অনুভব করে।

প্রশংসা করার পদ্ধতি:

১. **মৌখিকভাবে প্রকাশ করা** — যেমন: "বারাকাল্লাহ", "মাশা-আল্লাহ", "আলহামদুলিল্লাহ" বলা। এমনভাবে বলবেন, যাতে বাচ্চা আপনার আনন্দ বুঝতে পারে। মায়ের মুখে আনন্দ–ভরা প্রশংসা বাচ্চার মনে দারুণ প্রভাব ফেলে।

১. উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রশংসা করুন: প্রশংসা যেন শুধু মুখের কথা না হয়— হাত নাড়া, হাসি মুখে, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ও আনন্দ নিয়ে বাচ্চার সামনে প্রকাশ করুন। মুখের অভিব্যক্তি ও শরীরের ভাষা বাচ্চার উপর দারুণ প্রভাব ফেলে।

২. নির্দিষ্ট করে প্রশংসা তুলে ধরুন: যেমন: যদি বাচ্চা খেলনা গুছিয়ে রাখে, তখন শুধু বলবেন না "গুড বয়/গুড গার্ল"। বরং বলুন— "মাশা-আল্লাহ! তুমি কত সুন্দর করে খেলনাগুলো গুছিয়ে রেখেছো! খুব ভালো লাগলো মা!" এইভাবে কাজ ও প্রশংসা একসাথে বললে বাচ্চা বুঝতে পারে ঠিক কোন কাজের জন্য সে প্রশংসিত হচ্ছে।

৩. স্পর্শের মাধ্যমে প্রশংসা: টাচ বা শারীরিক সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি বাচ্চার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারেন, জড়িয়ে ধরতে পারেন বা স্নেহ করে চুমু খেতে পারেন। এই স্পর্শ বাচ্চার মনে প্রশংসার গভীর অনুভূতি তৈরি করে।

স্মরণযোগ্য কৌশল:

প্রথমে যেই আচরণটি সংশোধন করতে চান, তা নির্ধারণ করুন।

তারপর, বাচ্চা যেই ভালো কাজগুলো করছে, সেগুলোর প্রশংসা করুন।

মনে রাখবেন: “গুড বয়”, “গুড গার্ল”—এই ছোট বাক্যগুলো যথেষ্ট নয়। প্রশংসা যেন হয় নির্দিষ্ট ও অনুভূতিসম্পন্ন। তবেই বাচ্চা বুঝবে, মা-বাবা আমাকে ভালোবাসেন এবং আমি ভালো কিছু করছি।

Anticedents (পূর্ব প্রস্তুতি):

বাচ্চার আচরণ পরিবর্তনের জন্য যেসব কৌশল আগে থেকেই মাকে নিতে হয়, তাকে **Anticedents** বলে।

Anticedents মূলত ৩ প্রকার:

১. Prompts (নির্দেশনা):

Prompts হলো সরাসরি নির্দেশনা, যা দিয়ে বাচ্চাকে কোনো কাজ শেখানো বা করানো হয়। এটি তিনভাবে দেওয়া যায়:

i. মৌখিকভাবে (Verbal):

মুখে বলে নির্দেশ দেওয়া। উদাহরণ: **"বাবু, চল ব্রাশ করি"** বা **"এইভাবে ব্রাশ করতে হয়, দেখো"** অথবা **"নামাজের আগে অজু করতে হয়"** — এমন করে বলে শেখানো।

ii. শারীরিকভাবে (Physical):

বাচ্চার হাতে ধরে কাজটি করিয়ে দেওয়া। উদাহরণ:

তার হাত ধরে ব্রাশ করা শেখানো

অজু করিয়ে দেওয়া। খাবার ছড়িয়ে ফেললে সেটা গুছিয়ে দিয়ে বলা—

"এইভাবে গুছিয়ে খেতে হয়"

iii. ভিজ্যুয়াল (Visual):

নিজে করে দেখানো, যাতে বাচ্চা দেখে শিখতে পারে। এটাকে **Modeling**-ও বলা হয়। যেমন: নিজে দাঁত ব্রাশ করে দেখানো, বাচ্চা দেখে শিখবে।

২. Positive Setting Events (ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি):
এটা এমন পরিবেশ তৈরি করা, যাতে বাচ্চা সহজে নির্দেশ মেনে চলে।

i. মৌখিক: "চলো, এখন ব্রাশ করি!" এইভাবে আগেই মানসিক প্রস্তুতি তৈরি করা।

ii. শারীরিক: বাচ্চাকে ব্রাশ হাতে ধরিয়ে, বাথরুমে নিয়ে যাওয়া।

iii. ভিজ্যুয়াল: নিজে সামনে দাঁত ব্রাশ করা— যেন বাচ্চা দেখে অনুপ্রাণিত হয়।

২. Positive Setting Events (ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি):
এই পদ্ধতিতে বাচ্চাকে কোনো কাজ *পরোক্ষভাবে* করতে উৎসাহিত করা হয়। সরাসরি কিছু না বলেও এমনভাবে পরিবেশ তৈরি করা হয়, যাতে বাচ্চা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজটি করতে আগ্রহী হয়।

উদাহরণ: পরিবারের সবাই যদি সালাত পড়ে বা মসজিদে যায়, তাহলে সন্তানও নিজে থেকেই যেতে আগ্রহী হবে। তখন তাকে আলাদা করে বলার দরকার পড়বে না।
এখানে গুরুত্ব পায়: কীভাবে বলছি
কীভাবে পরিবেশ তৈরি করছি
কন্ঠস্বর কেমন (মমতাময়, ইতিবাচক, নম্র)

৩. Negative Setting Events (নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি):
এটাও পরোক্ষ পদ্ধতি, তবে এতে খারাপ প্রভাব পড়ে। যেমন:

বাচ্চাকে চিৎকার করে কথা বলা
রাগের সাথে আদেশ করা

ফলাফল: এইভাবে কাজ করালে, ভবিষ্যতে চিৎকার ছাড়া বাচ্চা আর কাজ করতে চাইবে না। এজন্য আমাদের কন্ঠস্বর ও আচরণ নরম ও ইতিবাচক হওয়া উচিত।

Prompts ও Positive Setting Events-এর সঠিক ব্যবহার:
আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে **Prompts** এবং **Positive Setting Events** নিয়ম মেনে ব্যবহার করব।

Anticedents কেমন হওয়া উচিত তার উদাহরণ:

১.সঠিক ও স্পষ্ট নির্দেশনা: "মা'র রুমে ফ্লোরে পড়ে থাকা খেলনাগুলো তুলে রাখো, আর ময়লা কাপড়গুলো বাসকেটে রাখো।
এইভাবে সুনির্দিষ্টভাবে বললে বাচ্চা কী করতে হবে, তা বুঝতে পারে এবং কাজ করতে আগ্রহ পায়।

২. গলার স্বর ও মুখের অভিব্যক্তির গুরুত্ব:
যখন আমরা কোনো **Anticidence (পূর্ব নির্দেশনা)** দিই, তখন আমাদের **গলার স্বর নরম ও মুখে হাসি থাকা** খুব গুরুত্বপূর্ণ।
যদি আমরা **হাসিমুখে, কোমল স্বরে** বলি, তাহলে বাচ্চা আগ্রহ নিয়ে ও দ্রুত কাজটা করে ফেলে।
কিন্তু যদি **চোখ রাঙিয়ে, রাগী ভঙ্গিতে বা আঙুল তুলে** কথা বলি, তাহলে তা **Negative Setting Event** হয়ে যায়, যা বাচ্চার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উদাহরণ:

সঠিকভাবে বলার পদ্ধতি: "তোমার স্কুল ড্রেসটা পরে ফেলো, প্লিজ।" (সুন্দর অভিব্যক্তি, কোমল গলার স্বরসহ বললে ভালো কাজ হয়)

৩. বাচ্চাকে চয়েস অফার করা:

শীতের সময় যদি বাচ্চাকে সরাসরি বলি— **"সুইটার পরো",** তখন সে না-ও বলতে পারে। বরং যদি জিজ্ঞেস করি, **"তুমি কোন রঙের সুইটার পরবে—নীল না লাল?"** তাহলে সে বিকল্প থেকে একটি বেছে নেবে এবং কাজটা করে ফেলবে।

কারণ: চয়েস দিলে বাচ্চা বুঝতে পারে, তারও স্বাধীনতা আছে। এতে না বলার সুযোগ কমে যায় এবং কাজটি হয়ে যায় সহজেই।

৪. বাচ্চাকে অনুরোধ করার সময় "Please" শব্দ ব্যবহার করা:

যখন আমরা চাচ্ছি বাচ্চা একটা ভালো অভ্যাস গড়ে তুলুক বা খারাপ আচরণ বাদ দিক, তখন **"Please"** শব্দটি ব্যবহার করলে বাচ্চা তা বেশি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে।

শর্ত:

রাগ করে **"Please"** বললে চলবে না।

মৃদু, ভালো স্বরে বলতে হবে।

বারবার **Please এটা করো, ওটা করো** বললে কার্যকারিতা হারাতে পারে।

তাই, নির্দিষ্ট আচরণ সংশোধনের সময়েই ব্যবহার করাই ভালো।

৫. বাচ্চাকে হেল্প অফার করা:

যখন বাচ্চা কোন কাজ শুরু করতে চায় না, তখন বলতে পারি— **"আমি সাহায্য করব, তুমি শুধু শুরু করো। তুমি পারবে ইনশাআল্লাহ"**

এতে বাচ্চার মনে হয় সে একা নয়। এতে করে কাজ শুরু করার প্রতি অনীহা কাটে এবং ধীরে ধীরে সে নিজে থেকেই আগ্রহ পায়।

৬. Playful Challenge বা মজার চ্যালেঞ্জ তৈরি করা:

বাচ্চাদের মাঝে প্রতিযোগিতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলা খুব কার্যকর। একটু খেলার ছলে চ্যালেঞ্জ দিলে তারা কাজটা আগ্রহের সাথে করে ফেলে। যেমন: **"তুমি তো এটা পারবে না, থাক তোমার ছোট ভাইকে বলি!"** তখন বাচ্চা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে দৌড়ে কাজটা করে ফেলে।

"দেখি তো তুমি পারো কিনা?" "তোমার শক্তি কেমন? আমার সোনাটা তো বড় হয়েছে!"

এইরকম মজার কথা বললে শিশুরা আনন্দ নিয়ে কাজ করে।

বাচ্চার আচরণ সংশোধনের জন্য উপরোক্ত **Anticidence (উদ্দীপনা)** গুলো **একসাথে সবগুলো প্রয়োগ করব না।**

যেটা তার জন্য সবচেয়ে উপযোগী মনে হবে, সেটাই বেছে নেব।

আচরণ ঠিক হয়ে গেলে, এই পদ্ধতিগুলো তখন আর ব্যবহার করার দরকার পড়বে না।

ধৈর্য ধরতে হবে। আচরণ এক দিনে বদলায় না। ধীরে ধীরে অভ্যাস তৈরি হয়। মায়ের সহনশীলতা ও ইতিবাচক মনোভাবই বাচ্চার ভিতরে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

৯. প্রশংসা করা (Praise করা):

যখন বাচ্চা কাঙ্ক্ষিত আচরণ করে, তখন তাকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশংসা করতে হবে। এতে তার ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ বাড়ে।

যেভাবে প্রশংসা করবেনঃ

মুখে **"মাশাআল্লাহ", "সাবাশ", "তুমি তো অনেক ভালো করেছো"** এই ধরনের কথাগুলো বলা।

চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা, আদর করা—শারীরিকভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করা।

হাসিমুখে, উচ্ছ্বসিত টোনে আনন্দ প্রকাশ করে প্রশংসা করা

মায়ের রাগ নিয়ন্ত্রণ

কেন আমাদের রাগ হয়?
রাগ হলে আমরা কী কী করি?
রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায় কী?

→ বাচ্চাদের উপর হঠাৎ মায়েদের রাগকে *Mom Rage* বলে। সামান্য ভুলেই আমরা বাচ্চাদের প্রতি অত্যধিক কঠোর হয়ে পড়ি। *Mom Rage* হলো কঠিন রকমের রাগ। মা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না। পরে এই রাগের জন্য অনুশোচনায় ভোগেন, কান্না করেন। মায়েরা এমন আচরণের জন্য নিজেকে দোষারোপ করেন।
বাচ্চার প্রতি অতিরিক্ত কঠোর হলে তাদের আচরণ সংশোধন করা যায় না। সঠিকভাবে *তারবিয়াহ* দেওয়া যায় না। শাস্তি দিলে অনেক সময় বাচ্চারা সেই কাজ আবারও করে ফেলে।

রাগের কারণঃ
রাগ হলো Secondary Emotion। রাগের পেছনে আরেকটি কারণ থাকে, যাকে বলে **First Emotion।** যে আচরণে মায়ের রাগ হয়, সেটাই প্রথম অনুভূতি বা First Emotion।

১. Anxiety (উদ্বেগ):

ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা—এসবের কারণে মায়ের রাগ হতে পারে। যেমন: **Covid-19** পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের অসচেতন আচরণ মায়ের মনে ভয় তৈরি করে, যা রূপ নেয় রাগে।

২. **গর্ভধারণের সময় শারীরিক পরিবর্তনের ফলে** মায়েরা অনেক সময় আগের বাচ্চার সাথে খারাপ আচরণ করে ফেলেন।

৩. **Postpartum Depression** (সন্তান জন্মের পর মায়েদের মানসিক অবসাদ)

৪. **Hormonal Imbalance**

৫. **Emotional Stress** *(আবেগজনিত চাপ)*

৬. **রাতে ঘুম না হওয়া** *(ঘুমের ঘাটতি)*

৭. **নিজের সময় বা "Me Time" না পাওয়া** (যেমন: সুইমিং, হাঁটা, বা নিজের জন্য একটু সময় না পাওয়া)

৮. **Dehydration** *(শরীরে পানিশূন্যতা)*

৯. **আশেপাশের মানুষের উস্কানিমূলক কথা** (যেমন: "তোমার বাচ্চা তো একদম কিছু শিখে না" — এসব কথায় মায়েরা রেগে গিয়ে বাচ্চাকে মার দেন।)

১০. **স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না থাকা বা তার দূরত্ব/উপেক্ষা করা** *(Husband being distant or harsh)*

১১. **পারিবারিক সম্পর্ক সবার সাথে ভালো না হলে**

১২. **অতিরিক্ত প্রত্যাশা বাচ্চার প্রতি থাকলে** যখন বাচ্চা সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না, তখন মায়েদের মধ্যে রাগ তৈরি হয়।

১৩. **মায়েরা যদি ছোটবেলায় নিজেরাই আবেগ নিয়ন্ত্রণ শেখেননি**, তাহলে বড় হয়ে নিজের সন্তানের সাথেও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না।

১৪. ইগো বা আত্মসম্মানে আঘাত: বাচ্চা যদি সবার সামনে মায়ের সম্মানে আঘাত করে, অসম্মানজনকভাবে কথা বলে, তখন মায়েরা রেগে যান।

১৫. ধৈর্যশীল না হলে: যে মা ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না, তার রাগ সহজেই উঠে যায়।

১৬. প্ল্যান অনুযায়ী না চললে রাগ হয়: যেমন, মা চায় বাচ্চা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাবে বা নির্দিষ্ট রুটিনে চলবে, কিন্তু বাচ্চা তা না করলে মা রেগে যান।

১৭. অন্য কাজে ব্যস্ত থাকা: যখন মা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন বাচ্চা কোনও কিছু চাইলেই মায়ের রাগ বেড়ে যায়। অথচ মা হিসেবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো বাচ্চার কাজ আগে করা, তারপর সংসারের অন্য কাজ দেখা।

১৮. দৈনন্দিন অব্যবস্থাপনা থেকেও রাগ জন্মায়: অনেক মায়ের দেখা যায় চুল আঁচড়ানো হয় না, গোসল হয় না, বিশ্রাম নেই—এসব শারীরিক অব্যবস্থা থেকেও রাগ জন্মাতে পারে।

১৯. ইবাদাতে অবহেলা: ঠিক সময়ে সালাত আদায় না করতে পারলে, ইবাদাতে মনোযোগ দিতে না পারলে অনেকে বাচ্চার উপর রেগে যান।

২০. ইন্টারনেট অ্যাডিকশন (আসক্তি): মায়েরা যদি ইন্টারনেটে আসক্ত হন, তাহলে তাদের সহ্যক্ষমতা কমে যায় এবং সামান্য বিষয়েও রেগে যান।

বাচ্চার উপর মায়ের রাগের প্রভাবঃ

১. **ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট বাধাগ্রস্ত হয়:** বাচ্চারা ক্রমাগত ভয়ে থাকে। এতে তাদের ব্রেইন স্বাভাবিকভাবে ডেভেলপ করতে পারে না।

২. **পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না:** বাচ্চারা বিভিন্ন পরিবেশে মানিয়ে চলার দক্ষতা হারায়।

৩. **অন্যদের সাথে মিশতে পারে না:** সামাজিক দক্ষতা গড়ে ওঠে না, শিশুটি একাকী হয়ে পড়ে।

৪. **স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ বেড়ে যায়:** রাগের কারণে বাচ্চার শরীরে কর্টিসল হরমোন নিঃসৃত হয়। শিশুটি কান্না করলেও অভিভাবকরা গুরুত্ব না দিলে কর্টিসল হরমোন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে।

৫. **কর্টিসল বিষের মতো কাজ করে:** এই হরমোনের পরিমাণ বেড়ে গেলে শিশুর ব্রেইনের স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংস হতে শুরু করে। এর ফলে শিশুর প্রতিভা, দক্ষতা, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। এমনকি লিভার সমস্যা, কিডনি সমস্যা, ব্রেইন ক্যান্সার, ডিপ্রেশন ও আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে।

৬. **মায়ের মুখ দিয়ে কষ্টের কথা বের হয়ে যায়:** রাগের সময় মায়েরা অনেক কষ্টের ও রুক্ষ কথা বলে ফেলেন, যেগুলোর প্রভাব শিশুর মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনেকে ভুল করে বদদোয়াও করে ফেলেন, যা করা একেবারেই উচিত নয়। কারণ রাগান্বিত অবস্থায় মা-বাবার দোয়া কবুল হতে পারে।

৭. **বাচ্চারা মায়ের আচরণ অনুকরণ করে:** যদি মা রাগ প্রকাশ করে, বাচ্চারাও সেটা শেখে। তারা বিশ্বাস করে রেগে যাওয়াই সমস্যার সমাধান, ফলে তারাও রাগান্বিত আচরণ করতে শুরু করে।

৬. **হীনমন্যতা:** মায়ের রাগের কারণে বাচ্চারা নিজেদেরকে খারাপ, অযোগ্য, অপ্রিয় মনে করতে থাকে। এতে তারা হীনমন্যতায় ভুগে।

৭. **হিংস্রতা বা কঠোরতা:** অনেক বাচ্চা মায়ের রাগ দেখে হিংস্র বা কঠোর হয়ে যায়। তারা অন্যদের প্রতিও সেই আচরণ রপ্ত করে।

৮. **নীতিহীনতা ও মানসিক সমস্যা:** যেসব বাচ্চারা অতিরিক্ত কঠোর পরিবেশে বড় হয়, তারা বড় হয়ে নীতিহীন হয়ে পড়ে এবং দুশ্চিন্তায় ভোগে। ঘুমের সমস্যা হয়। **শারীরিক আঘাতের চেয়েও মারাত্মক হলো:** – বকাঝকা – চিৎকার – গালিগালাজ – বাচ্চাকে "অলস", "বেয়াদব", "শয়তান" বলা এইসব কথাবার্তা শিশুকে মানসিকভাবে ভেঙে ফেলে, যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী।

রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায়ঃ

১. **মনেপ্রাণে সে রকম মা হওয়ার চেষ্টা করা:** আমরা যেন সেই রকম মা হই, যেরকম মা আমরা নিজেরা ছোটবেলায় চাইতাম।

২. **নিজের উপর অতিরিক্ত স্ট্রেস না নেওয়া:** সবকিছু নিখুঁতভাবে সামলাতে গিয়ে নিজের উপর চাপ না দিয়ে ধীরে ধীরে সব সামলানো।

৩. **দায়িত্বের বিষয়টি মনে রাখা:** মনে রাখতে হবে, আমরা সন্তান পালনের দায়িত্বে আছি। একদিন এই দায়িত্বের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৪. সাধারণ রাগ ও ক্রোধের মধ্যে পার্থক্য করা: কোনটা ন্যায্য রাগ আর কোনটা না বুঝে অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে তা বোঝা দরকার। কখন রাগ দরকার, কখন নয় – সেটা বোঝার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৫. রাগের কারণ খুঁজে বের করা ও তার সমাধান খোঁজা: রাগের পিছনে যে আসল ইমোশন বা ঘটনা রয়েছে, তা চিনে তার সমাধান খোঁজা জরুরি।

৬. রাগ উঠলে বাচ্চার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া: নিজেকে সামাল দিতে হলে বাচ্চাকে বলা, "তুমি এখন একটু দূরে যাও, আমার রাগ হচ্ছে।" এতে বাচ্চার উপর রাগের প্রতিক্রিয়া পড়বে না।

৭. সুন্নাত অনুযায়ী আচরণ করা: রাগ হলে দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়া, বসে থাকলে শুয়ে পড়া – যেমন হাদিসে এসেছে।

৮. পানি খাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত শোনা বা দু'আ করা: রাগ প্রশমনকারী আমলগুলো করতে চেষ্টা করা।

৯. "আউযুবিল্লাহ" পড়া: "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতোয়ানির রাজিম" পড়লে রাগ কমে যায়। এটা শিশুদেরও শেখানো – যেন তারা বলে, "আমি যদি রেগে যাই, তোমরা আমাকে এ পড়া শুনিয়ে দিবে বা ফু দিবে।"

১০. বাচ্চা রেগে গেলে সেই মুহূর্তে তাকে বোঝাতে না যেয়ে শান্ত হতে সময় দেওয়া: রাগের মুহূর্তে শেখাতে গেলে বাচ্চা আরও জেদ ধরে। আগে তাকে শান্ত হতে দিন, তারপর বোঝান।

১১. বাচ্চাকে কথা বলার সময় দেওয়া: ওর কথা মন দিয়ে শোনা। ওকে বুঝতে দেওয়া যে, আমরা ওর অনুভূতির কদর করছি। ওর সমস্যার সমাধানটাও যেন ওর মুখ থেকেই আসে। এতে বাচ্চা নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে শিখবে এবং বুঝবে যে ওর মতামতের দাম আছে।

১২. বাচ্চার Emotion-কে মূল্যায়ন করা: বাচ্চা রেগে গেলে বা কষ্ট পেলে তাকে বলা, "হ্যাঁ তোমার রাগ হওয়ারই কথা", "তোমার জায়গায় আমি থাকলেও আমি এমনটাই করতাম।" – এই কথাগুলো বলে তার অনুভূতির সাথে মিশে যেতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে বোঝাতে হবে, "তোমার রাগটা ঠিক ছিল, কিন্তু যেভাবে তুমি বলেছো বা করেছো, সেটা ঠিক ছিল না।" এইভাবে তার অনুভূতিকে অবমূল্যায়ন না করে, ধীরে ধীরে আচরণটা সংশোধনের পথে নিয়ে আসা যাবে।

শিশুদের সাথে নবীজী (সা)-এর আচরণ

এখন সবাই পজিটিভ প্যারেন্টিং নিয়ে সচেতন। অনেকে এটা প্র্যাকটিসও করছেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা) আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই আমাদের পজিটিভ প্যারেন্টিং শিখিয়ে গেছেন। আমরা হাদিস থেকে শিখি নবীজী (সা)-এর সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা, আদর এবং নম্রতার আচরণ।

১. আদর ও স্নেহ করা:

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন—

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا"

“**“সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না।”**

(সুনান আবু দাউদ – ৪৯৪৩, তিরমিযী – ১৯২১, মুসনাদ আহমাদ – ২৩৪৯৫)

-

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নাতিকে চুমু খেলেন। তখন এক সাহাবী বললেন, “আমি আমার সন্তানদের কখনো চুমু খাইনি।” তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন— **“যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না।”**

২. বেদুইন শিশুকে আদর করা:
হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন— রাসূলুল্লাহ (সা) এক বেদুইন শিশুকে আদর করে, ভালোবাসা দেখাতেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো বাচ্চাদের এত আদর করতাম না।”
এতেই বোঝা যায়, নবীজী (সা) ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়ের, বিশেষ করে শিশুদের প্রতি।

এক সাহাবী বললেন, "আমি তো আমার সন্তানদের কখনোই চুমু খাই না।"
তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন:
"আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় থেকে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে আমি আর কি করতে পারি?"

৩. নবীজী (সা)-এর শিশুদের সাথে খেলাধুলা: একবার কিছু সাহাবী নবীজী (সা)-এর সাথে দাওয়াত খেতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাস্তায় দেখা গেল হুসাইন (রা) খেলা করছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) দুই হাত ছড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন যেন আদরে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। এটাই ছিল নবীজী (সা)-এর ভালোবাসা ও কোমলতা।

৪. মাথায় হাত বুলিয়ে দোআ করা: আল্লাহর রাসূল (সা) শিশুদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন।
জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
“আমি অনেকবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। সালাত শেষে তিনি আমাদের সাথে কথা বলতেন এবং

আমাদের গালে হাত বুলিয়ে দিতেন। আমি এখনও তাঁর হাতের ঠান্ডা ও সুগন্ধি অনুভব করি।”
(সহীহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ৮৭৩)

৫. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিশুদের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত:
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের প্রতি অত্যন্ত কোমল ও দয়ালু ছিলেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি শিশুদের সালাম দিতেন, তাদের মাথায় হাত বুলাতেন, চুমু খেতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। এই কাজগুলো মেনে চলা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ।
জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমি অনেকবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। সালাত শেষে তিনি আমাদের সাথে কথা বলতেন এবং আমাদের গালে হাত বুলিয়ে দিতেন। আমি এখনও তাঁর হাতের ঠান্ডা ও সুগন্ধি অনুভব করি।”
(সহীহ বুখারি, হাদিস: ৬০০৪)

৬. শিশুদের অনুভূতির মূল্যায়ন করতেন: রাসূলুল্লাহ (সা) হাসান ও হুসাইন (রা)-কে কোলে নিয়ে সালাতের জন্য বের হতেন। একবার তিনি তাঁদের একজনকে পাশে রেখে সালাত আদায় করছিলেন। সিজদা দীর্ঘ সময় ধরে করেছিলেন, কারণ তাঁর নাতি তখন তাঁর পিঠের উপর উঠে গিয়েছিল। তিনি সেই অবস্থায় ধৈর্য ধরে ছিলেন যতক্ষণ না শিশু নিজে থেকে নেমে আসে। এ থেকেই বোঝা যায়, শিশুদের অনুভূতির প্রতি তাঁর কত গভীর মমত্ববোধ ছিল।

৭. আনন্দ দেওয়ার জন্য কাঁধে তুলে নেওয়া:

শিশুরা বাবার বা মায়ের কাঁধে উঠে খুব আনন্দ পায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) সেই আনন্দ দিতেন। তিনি নিজে বাচ্চাদের কাঁধে তুলে নিতেন।

এক সফর থেকে ফেরার পর, নবীজী (সা) আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, জাফর ও আরও কয়েকজন শিশুকে তাঁর বাহনে উঠিয়ে নেন। তিনি তাদের প্রতি করুণাশীল আচরণ করতেন।

পজিটিভ প্যারেন্টিং এর পাঁচটি স্তম্ভ

Positive Parenting বলতে বোঝায়—শিশুর প্রতি **নম্রতা, ভালোবাসা ও বুঝিয়ে চলার আচরণ**, যা **রাসূলুল্লাহ (সঃ)**-এর সুন্নাত অনুযায়ী গড়ে তোলা হয়।

১. শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশ:

শিশুকে প্রতিনিয়ত মারধর, বকাঝকা করলে বা তার হাত থেকে কিছু পড়ে গেলেই চিৎকার করলে—সে ভীতু হয়ে পড়ে। এরকম পরিবেশ শিশুর জন্য নিরাপদ নয়। যেমন, বাবা ঘরে ঢুকলেই যদি শিশুর মনে হয়—"আবার হয়তো মার খেতে হবে", তাহলে সেটা খুবই ভয়ানক মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করে। শিশুর জন্য শান্তিপূর্ণ, ভালোবাসাময় পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে—যেখানে সে নিজের ভুল শিখবে, আবার ভুল থেকেও শিখবে। শিশুকে এমনভাবে বড় করতে হবে যেন সে যেকোনো বিষয় মা-বাবার সাথে নির্ভয়ে শেয়ার করতে পারে।

২. Positive Learning Environment (ইতিবাচক শেখার পরিবেশ):

শিশুকে ভালোবাসা দিয়ে শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

তাকে আদব-কায়দা শেখানো

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ভালোবাসতে শেখানো

দোয়া, কুরআনের আয়াত, ইসলামী শিষ্টাচার শেখানো

এসব বিষয় শিশুকে বুঝিয়ে, ধীরে ধীরে ও উদাহরণ দিয়ে শেখানো উচিত।

শিশুকে শেখাতে হবে **ভালোবাসা, স্নেহ ও ধৈর্য দিয়ে।** যদি কোনো বিষয় সে বুঝতে না পারে বা শেখায় চাপ অনুভব করে—তবে তাকে ধীরে ধীরে, একটু একটু করে শেখাতে হবে। শুধু শেখানো নয়, ভালো অভ্যাসে পরিণত করতে হবে ভালোবাসা ও উৎসাহের মাধ্যমে।

যদি মা ও পরিবারের অন্যরা আমল করে, নামাজ পড়ে—তাহলে বাচ্চারাও দেখে দেখে তা শিখে ফেলে।

যদি বাচ্চা কোনো ভালো কাজ করে—তাকে প্রশংসা করতে হবে।

3. Positive Discipline (ইতিবাচক শাসন):

শাসন মানেই কঠোরতা নয়। **শাসন হতে হবে গঠনমূলক ও সীমারেখা নির্ধারণমূলক।** শিশুকে অন্যায় বা ভুল করলে শিখাতে হবে, তবে সেটা যেন তাকে ভীত বা অপমানিত না করে।

বালেগ ছেলে নামাজ না পড়লে তখন শাসন কড়াকড়ি হতে পারে, কিন্তু শিশুর ওপর অন্যায় বা জুলুম করা যাবে না।

এটা একপ্রকার পছন্দনীয় বাধ্যবাধকতা (preferred structure)—যেখানে শিশুর জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা সীমা নির্ধারণ করে দিতে হয়।

যেমন:

স্ক্রিন টাইম

পড়ার সময়

খেলার সময়

ভাইবোনদের ঝগড়া—এই ক্ষেত্রে বলবে: “তোমরা আমার সামনে মারামারি করতে পারবে না।”

এই নিয়মগুলো প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি।

৪. Visible Expectation (বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা):

বাচ্চাদের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা যেন বাস্তবসম্মত হয়। প্রত্যাশা করার সময় বাচ্চার বয়স ও স্বাভাবিক বিকাশের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন: আমরা যদি ছোট শিশুর কাছ থেকে বড়দের মতো পরিপাটি করে ভাত খাওয়ার প্রত্যাশা করি, তাহলে সেটা হবে ভুল। এই বয়সে সে ভাত ছিটিয়ে ফেলবে—এটা স্বাভাবিক। একটা নির্দিষ্ট বয়সে গিয়ে সে নিজেই ঠিকভাবে খেতে শিখে যাবে। তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে—বাচ্চা তার বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করছে কিনা।

যদি দেখা যায় বাচ্চা সঠিক সময়ে কথা বলতে পারছে না, তাহলে আমাদের খুঁজে দেখতে হবে এর কারণ কী। বাচ্চার সাথে পর্যাপ্ত কথা বলা হচ্ছে কিনা, সেটা দেখতে হবে। তার ভাষা বিকাশে (Language Delay) কোনো সমস্যা আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

৫. Good Self-Care:

একজন মা ভালোভাবে নিজের যত্ন না নিলে, সন্তানের প্রতিও ভালো ব্যবহার করতে পারেন না। যদি মা মানসিকভাবে চাপগ্রস্ত, শারীরিকভাবে অসুস্থ বা ঘুমের ঘাটতিতে ভোগেন—তাহলে তার পক্ষে ধৈর্য ধরে শিশুকে সামলানো সম্ভব হয় না।

তাই মায়ের যত্ন নেওয়াটা খুব জরুরি।

মায়ের ঘুম,

পর্যাপ্ত খাবার,

মানসিক প্রশান্তি,

ও সময়মতো বিশ্রাম—এসব নিশ্চিত করতে হবে।

পরিবারের সকল সদস্যের উচিত মায়ের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা। একজন সুস্থ, প্রশান্ত মা-ই পারে সন্তানের জন্য স্নেহময় ও ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে।

লুকমান হাকিমের উপদেশসমূহ

লুকমান হাকিম ছিলেন একজন জ্ঞানী ও হিকমতপূর্ণ মানুষ। তিনি নবী ছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞান ও উপদেশের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। *সূরা লুকমান* নামে কুরআনে একটি পূর্ণ সূরা রয়েছে, যেখানে তিনি তাঁর সন্তানকে যে দশটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন, তা অভিভাবকদের জন্য চিরন্তন শিক্ষা।

১. তাওহীদ ও শিরক বিষয়ে শিক্ষা দান

"হে আমার বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক একটি মহাপাপ।"
(সূরা লুকমান: ১৩)
শিশুদের প্রথম শিক্ষা হওয়া উচিত — একমাত্র আল্লাহই আমাদের ইলাহ, তাঁর কোনো অংশী নেই।
শিশুকে শিরক কী এবং কেন তা করা যাবে না, তা বারবার সহজ ভাষায় বোঝাতে হবে।
বিভিন্ন খেলনা বা গল্পের মাধ্যমে "এক আল্লাহ" বিশ্বাসটি মজবুত করতে হবে।

২. পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ ও কৃতজ্ঞতা

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি।" (সূরা লুকমান: ১৪)
মা-বাবার আদব শেখাতে হবে ছোট থেকেই।
শিশুকে বোঝাতে হবে, মা-বাবা অনেক কষ্ট করে তাকে বড় করছে।

শেখাতে হবে কিভাবে মা-বাবার কথা শোনা, ধৈর্য ধরা ও তাদের প্রতি নম্র হওয়া যায়।
এমনকি বাবা-মা যদি অমুসলিম বা ভুল কিছু বলেন, তবুও সম্মান বজায় রাখতে হবে। শুধু গোনাহের কাজে সহযোগিতা করা যাবে না।

৩. আল্লাহ সব কিছু জানেন ও দেখেন

"হে আমার বৎস! যদি সরিষার দানার সমান কিছু কোনো পাথরের ভেতরে, আকাশে বা জমিনে থাকে, আল্লাহ তা অবশ্যই উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছু জানেন।"
(সূরা লুকমান: ১৬)
শিশুদের শেখাতে হবে: মা-বাবা না দেখলেও, আল্লাহ সবসময় আমাদের দেখেন।
শিশুর মনে *তাকওয়া* বা আল্লাহভীতি গড়ে তুলতে হবে।

৪. সালাত কায়েম করা

"হে আমার বৎস! সালাত কায়েম করো।"
(সূরা লুকমান: ১৭)
সাত বছর বয়স থেকেই সালাত শেখানো শুরু করতে হবে।
কঠোর না হয়ে আদর, উৎসাহ ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সালাতের অভ্যাস গড়তে হবে।
একটা টেকনিক হতে পারে: বলো, "এটা বড়দের কাজ, তুমি এখনো ছোট, পরে শিখবে।" এতে শিশুরা নিজেই তা প্রমাণ করতে চায় যে সে পারবে।

৫. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ

“আর ভাল কাজের আদেশ দাও ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর।”

(সূরা লুকমান: ১৭)

শিশুকে শেখাতে হবে — নিজের মতো অন্যকেও ভালো কাজ করতে উৎসাহ দিতে হবে।

খারাপ কিছু দেখলে চুপ না থেকে নম্রভাবে বোঝাতে হবে — ‘এটা ভালো না, এটা ভুল, তুমি চাইলে ভালোভাবে করতে পারো।’

৬. ধৈর্য ধারণ করা

“আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আসে, তা ধৈর্য্যসহ গ্রহণ করো। নিশ্চয় এটিই দৃঢ় সংকল্পের কাজ।”

(সূরা লুকমান: ১৭)

শিশুকে শেখাতে হবে কষ্ট বা সমস্যা এলে ধৈর্য ধরতে হয়।

ধৈর্য মানে চুপ করে থাকা নয়, বরং সমস্যা হলে সঠিকভাবে প্রকাশ করা ও মেনে চলা।

৭. অহংকার ও গর্ব থেকে বিরত থাকা

“তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং জমিনে অহংকার করে চলাফেরা করো না।”

(সূরা লুকমান: ১৮)

শিশুকে শেখাও: কাউকে ছোট করে দেখা, ধমকানো, হাসাহাসি করা — এগুলো খারাপ অভ্যাস।

অহংকার আল্লাহর অপছন্দ।

৮. নম্র ও সুন্দরভাবে কথা বলা

“তুমি তোমার কন্ঠস্বর নিচু করো। নিশ্চয় সবচেয়ে বাজে আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।” (সূরা লুকমান: ১৯)

শিশুকে শেখাও কীভাবে নিচু স্বরে কথা বলতে হয়।
চিৎকার বা রাগারাগি না করে শান্ত ও ভদ্রভাবে নিজের কথা বলা একটি বড় গুণ।

৯. জীবন ব্যবস্থা হিসেবে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া

দ্বীন হলো জীবন চলার পথ। বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই কুরআন, দুআ, রাসূল (সা.)-এর আদর্শ, ও ইসলামী মূল্যবোধ শেখাতে হবে।
শিশুরা যেন বাবা-মা বা বড়দের ভুল ধরলেও সম্মান রেখে বলে। যেমন: ভুলে মাকে 'তুমি কিছুই বোঝ না' বলা হলে মা বলবেন: "এইভাবে না বলো, বলো— মা, আপনি কি এভাবে ভাবছেন?"

১০. নিজের চরিত্র গঠনে নজর দেওয়া

শিশুদের শেখাতে হবে যে পাপ হোক ছোট বা বড়, আল্লাহ সবই জানেন। ঘরে বাইরে, কারো সামনে বা না থাকলেও সবসময় সৎ ও ভদ্র আচরণ করতে হবে।

এই উপদেশগুলো শুধু বাচ্চাদের জন্য নয়, বরং মা-বাবারাও যেন নিজেকে সংশোধন করে একটি সুন্দর ইসলামী পরিবেশ তৈরি করেন, সেটাই মূল শিক্ষা।